নিরাপত্তা শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা



জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
কলিকাতা ৭০০০৭৩

নিরাপত্তা শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশিরকুমার চক্রবর্তী

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক
জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র

প্রাথমিক চিকিৎসার বিভিন্ন উপকরণ-সহ বিশেষ ধরনের নির্মিত একটি বাক্স কিনতে পাওয়া যায়। তাকে বলে ফার্স্ট-এড বক্স। ফার্স্ট-এড বাক্সে প্রয়োজনীয় সবরকম ওষুধপত্র এবং তূলা, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি থাকে। এছাড়া কিছু স্প্লিণ্ট, নিরেট রড, খানিকটা শক্ত দড়ি, একটি ধারালো ছুরি ও একটি স্ট্রেচার প্রয়োজন। ফার্স্ট-এড বক্স কেনা সম্ভব না হলে এইসব ওষুধ ও জিনিসপত্র কিনে বা যোগাড় করে রাখা দরকার ঃ—

১। বরিক কটন ২। ব্যাণ্ডেজ ৩। পারম্যাঙ্গানেট অব পটাস্ ৪। লাইকার অ্যামোনিয়াম ৫। স্টিকিং প্লাস্টার ৬। ডেটল ৭। টিংচার আয়োডিন ৮। কটন প্যাড ৯। পরিষ্কার কাপড়ের ফালি ১0। কাপড়ের পাড় অথবা সুতলী ১১। রবারের নল ১২। স্মেলিং সল্ট ১৩। স্পিরিট ১৪। বার্নল ১৫। সালফানিলামাইড পাউডার ১৬। ছুরি ১৭। একটি গোটানো পাখা ১৮। স্ট্রেচার অথবা খাটিয়া ১৯। ফাঁপা চাবি ২0। কাঁচি।

নিরাপত্তা শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

দুর্ঘটনা পদে পদে ঃ

রাস্তা দিয়ে চলেছ। হঠাৎ গাড়ী এসে দিল পিছন থেকে ধাক্কা। নৌকায় নদী পার হচ্ছ, মাঝ নদীতে নৌকা গেল ডুবে। কাটারি দিয়ে ডাব কাটছ, হাত ফস্‌কে কোপ লাগল আঙ্গুলে ; রক্ত পড়তে লাগল ঝর ঝরিয়ে। কলার খোসায় পা পিছলে আছাড় খেয়ে হাত পায়ের হাড় গেল ভেঙে।

মনে করেছো, চুপ চাপ ঘরে বসে থাকলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না ? মোটেই তা নয়। ঘরের ভেণ্টিলিটার কি চালের মটকায় কখন যে বোলতার চাক বেঁধেছিল কেউ তা খেয়াল করেন নি। বোঁ করে একটা বোলতা উড়ে এসে হুল ফুটিয়ে দিল নাকের ডগায়। হয়তো বা শীতের দিনে চাদর গুড়ি দিয়ে আগুন পোহাচ্ছ উনানের ধারে বসে। চাদরের খুঁটে আগুন লেগে জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। কত আর বলি। এরকম আরও কত কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এইসব দুর্ঘটনার ফলে

কত মানুষের অঙ্গহানি হয়; কত মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়, অকালে প্রাণ হারায় কত মানুষ।

অথচ একটু চেষ্টা করলে, চোখ কান একটু খুলে রেখে কাজ করলে, একটু সাবধানে চলাফেরা করলে মানুষ অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। আবার দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে রোগীকে সুস্থ রাখার বিদ্যাটা জানা থাকলে, তত ভয়ের কারণ থাকে না। দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় যে বিদ্যার জন্য, তাকে বলে নিরাপত্তা শিক্ষা। আর দুর্ঘটনায় পতিত মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা ও সুস্থতা বিধানের ব্যবস্থা করার যে বিদ্যা তার নাম প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রাথমিক প্রতিবিধান। নিরাপত্তা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মগুলি প্রতিটি নাগরিকের জেনে রাখা উচিত।

নিরাপত্তা শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা :

নিরাপত্তার অপর নাম সাবধানতা। সাবধানে চলাফেরা করলে দুর্ঘটনা কম ঘটে। কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যে, সাবধান হওয়ার কোন সময়ই পাওয়া যায় না এবং

সাবধান হলেও আঘাত লাগে বা শরীরের ক্ষতি হয়। তখন আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা না করলে তার প্রাণের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ধর, কোন ব্যক্তি যথেষ্ট সাবধানী এবং সাবধানেই চলাফেরা করেন। তিনি বাস ধরার জন্য রাস্তায় একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ বিপরীতমুখী দুটি বাসে ধাক্কা লাগায় একটি বাসের চাকা তাঁর পায়ের উপর দিয়ে চলে যাওয়ায় পায়ের হাড় ভেঙে গেল ও আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তপাত হতে থাকল প্রচুর পরিমাণে। নিরাপত্তা শিক্ষার নিয়ম জানা ও মেনে চলা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই না পাওয়ায় সে শিক্ষায় কোন কাজ হল না। এখন ডাক্তারখানা কি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে রক্তপাত বন্ধ করতে না পারলে এবং ভগ্ন পা'টিকে ঠিকমত বাঁধাবাধি করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারলে হয়তো পা'টিকে জন্মের মত কেটে বাদ দিতে হবে। হয়তো বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে না যেতেই রক্তপাত বা শকের ফলে তাঁর প্রাণহানি ঘটতে পারে। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে রক্তপাত বন্ধ করা, পা'টিকে ঠিকমত বাঁধা, শকের চিকিৎসা করা এবং ভগ্নস্থানে যেন আঘাত না লাগে, সেরূপ সাবধানতার

নিয়মগুলি জানা থাকলে কোন ভয় থাকে না। কাজেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব কাজ সম্পন্ন করা রোগীর নিরাপত্তার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং নিরাপত্তা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মকানুন এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্মও জানা ও শেখা দরকার। প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান নিরাপত্তা শিক্ষার অঙ্গ বিশেষ। এখানে তাই দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় এবং দুর্ঘটনায় আহত হলে কি ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার সে বিষয়ে পরপর আলোচনা করা হল :—

আঘাত :

আঘাত নানা কারণে লাগতে পারে। যেমন :—

(ক) সাইকেলে সাইকেলে ধাক্কা লাগার ফলে পড়ে গিয়ে।

(খ) পথ চলার সময় কি জনবহুল রাস্তা পার হওয়ার সময় যে কোন গাড়ীর ধাক্কায়।

(গ) গাছের ডাল, ভাঙা প্রাচীরের অংশ বা কোন ভারী কঠিন দ্রব্য দেহের কোন অংশে পতিত হলে।

(ঘ) কোন উচ্চস্থান থেকে পড়ে গেলে।

(ঙ) রেল, মোটর প্রভৃতি কোন দ্রুতগতির যানবাহন থেকে পড়ে গিয়ে। ঐসব যানবাহনের চাকা হাত-পায়ের উপর দিয়ে চলে গেলে বা যানবাহনাদি কোন কারণে স্থানচ্যুত হলে।

(চ) গবাদি পশুর দ্বারা আহত হলে।

(ছ) কোন কিছু কঠিন দ্রব্যের দ্বারা আঘাত লাগলে।

আঘাতের ফলে কি হয় ?

(ক) অস্থি-সন্ধি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

(খ) আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি মচ্‌কে যাওয়ায় (স্প্রেইন) ফুলে যায়, ব্যথা হয়, নাড়াচাড়া করলে লাগে।

(গ) শক্‌ পায়।

(ঘ) মাংসপেশী মুচড়ে যায় (স্ট্রেইন)।

(ঙ) মাংসপেশীর অংশ বিশেষ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ভিতরে রক্তপাত হয় ও সেখানটি ফুলে ওঠে।

(চ) মুচড়ে যাওয়া স্থানটি নাড়াচাড়া করতে পারা যায় না।

(ছ) হাড় ভেঙে যায় ও ক্ষত সৃষ্টির ফলে রক্তপাত হয়।

আঘাত সম্বন্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা :

(ক) নিয়ম অনুযায়ী রাস্তায় বামদিক দিয়ে চলাচল করা।

(খ) জনবহুল শহরের রাস্তা পার হওয়ার সময় চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া।

(গ) সাইকেল সাবধানে চালানো।

(ঘ) ট্রেন ও বাস থামার পর তবে নামাওঠা করা এবং চলন্ত গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে না ঝোঁকা।

(ঙ) ভাঙা প্রাচীর ইত্যাদির পাশে না দাঁড়ানো, পাশ দিয়ে না যাওয়া বা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তা ভেঙে ফেলা।

(চ) উচ্চস্থানে যথেষ্ট সাবধানতা ও প্রস্তুতির সঙ্গে ওঠা।

(ছ) গবাদি পশুদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা।

আঘাতের ফলে আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা :

রোগীকে শুইয়ে রেখে মচকে যাওয়া জায়গাটির নাড়াচাড়া বন্ধ রাখা। ঠাণ্ডা জলের কম্প্রেস দেওয়া। পা ফুলে উঠলে জুতো খুলে নেওয়া। গোড়ালী ভেঙে গেলে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া। মুচড়ে গেলে কম্প্রেসের পরে এডহেসিভ প্লাস্টার দেওয়া। হাড় ভেঙে গেছে

কিনা পরীক্ষা করা। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে দু'পাশে স্প্লিণ্ট বেঁধে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া। শক্ পাওয়ার ক্ষেত্রে শকের চিকিৎসা করা। ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার ফলে রক্তপাত হলে রক্তপাত বন্ধ করা ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রোগীকে স্ট্রেচারে শুইয়ে নিকটবর্তী ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

জলে ডোবা ঃ

নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ— ১। সাঁতার শেখা। ২। জলে-ডোবা রোগীকে জল থেকে তোলার জন্য তার খুব কাছাকাছি না যাওয়া। ৩। দল, পানা ও গাঁজলা ভর্তি পুকুরে ডুব জলে না যাওয়া। ৪। সাঁতার কাটার ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হলে সাঁতার কেটে ডুব জলে না যাওয়া। আলগা কাপড় চোপড় পরে সাঁতার না কাটা। ৫। অতিরিক্ত যাত্রীবহুল নৌকায় না চাপা। নৌকার ধারে না দাঁড়ানো। সাঁতার না জানা থাকলে ঝড় বৃষ্টিপাতের দুর্যোগের দিনে নৌকায় নদী পারাপার না করা। প্রবল স্রোতবহুল নদীতে সতর্কতার সঙ্গে নামা ও স্নান করা।

জলে ডোবার ফলে কি হয়?

শ্বাসনলে বা ফুসফুসে জল ঢুকে শ্বাস বন্ধ হওয়ার

ফলে মৃত্যু হয়। মৃত্যু না হলেও অনেক সময় অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। পেটে জল ঢুকে যায়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে নানাবিধ ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালু হওয়ার পরেও শকের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

জলে ডোবা ব্যক্তির উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা :

(১) জলে ডুবছে এমন লোকের কাছাকাছি গেলে প্রাণে বাঁচবার জন্য সে উদ্ধারকারীকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যে, সাঁতার জানলেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। ডুবন্ত ব্যক্তির সঙ্গে উদ্ধারকারীও জলে ডুবে যেতে পারে। তাই এমন নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তাকে ধরতে হবে সে যেন উদ্ধারকারীকে জড়িয়ে ধরতে না পারে।

(২) সাঁতার জানা না থাকলে ডুব জল না হলেও জলে-ডোবা ব্যক্তির জ্ঞান থাকলে, তাকে উদ্ধারের জন্য জলে নামা উচিত নয়। পাড় থেকে লম্বা দড়ি বা কাপড় ছুঁড়ে দেওয়া উচিত যেন সে তা ধরতে পারে। তারপর সেইটি টেনে তাকে তুলে ফেলতে হবে।

(৩) নাক মুখ থেকে জল কাদা শ্লেষ্মা ইত্যাদি আঙ্গুল দিয়ে বের করতে হবে।

(৪) জল থেকে তোলার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ

চালু থাকলে, তার পায়ের গোছ দুটি ধরে মাথাটা নীচের দিকে করে, ঝাঁকানি দেবে ও মাথার চারপাশে ঘোরাবে। এই ঘোরানোটা অবশ্য বালক, শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। বয়স বেশী হলে উপুড় করে শুইয়ে পেটে দু'হাতের চাপ দিয়ে জল বের করে দেবে।

(৫) কোমরের কাপড় আলগা করে দেবে এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালু রাখা ও চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।



শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালু করার প্রক্রিয়া

চিত্র নং ১

(৬) শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালু হওয়ার পরেও অন্ততঃ ১৫ মিনিট এই কৃত্রিম প্রক্রিয়া চালু রাখবে এবং গরম কাপড় দিয়ে গা ঢেকে রাখবে। রোগীর জ্ঞান থাকলে

গরম দুধের সঙ্গে দু'চার ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খাওয়াবে।



চিত্র নং ২

(৭) তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে পাঠাবে বা হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

(৮) ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া রোগীকে শুতে দেবে না।

পাগলা শিয়াল, কুকুরে কামড়ানো ঃ

(১) নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) কুকুর এবং শিয়াল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া। (খ) পাগলা শিয়াল কুকুরের চলন অস্বাভাবিক হয়, চাউনি ঘোলাটে দেখায় এবং লেজ ঝুলে পড়ে। এই রকম কুকুর শিয়াল দেখামাত্র মেরে ফেলা।

(২) প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—পাগলা শিয়াল কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। বিষ নার্ভের ভিতর দিয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রোগ লক্ষণ ঃ সাধারণতঃ কামড়ের ২ সপ্তাহ পরে প্রকাশ পায় এবং ছ'সপ্তাহের মধ্যে প্রকট হয়। কামড়ানোর ২ সপ্তাহের মধ্যে পাগলা শিয়াল কুকুর মরে যায়। পাগলা শিয়াল কুকুরে কামড়ালে ক্ষতস্থান নাইট্রিক বা কার্বলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। রক্তপাত হতে থাকলে তা বন্ধ করা চাই। তারপর ক্ষতস্থান বন্ধ করে কাছাকাছি ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। জলাতঙ্ক রোগের ইনজেকশান নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

সাপে কামড়ানো ঃ

(১) নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) ঘরে বা বাড়ীর উঠানে জঞ্জালের স্তূপ না রাখা। (খ) বাড়ীতে ইঁদুরের ও ব্যাঙের উপদ্রব বন্ধ করা। (গ) বনে জঙ্গলে সাবধানে ও জুতা পায়ে চলাফেরা করা। (ঘ) অন্ধকার রাত্রে বিনা আলোয় এবং খালি পায়ে রাস্তা না চলা। (ঙ) বর্ষাকালে মেঠো রাস্তায় চলাচলের সময় গাম-বুট (হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা একরকম রবারের

জুতা) ব্যবহার করা। (চ) বাড়ী ও আশেপাশের ইঁদুরের গর্ত সবসময় বুজিয়ে ফেলা। (ছ) শীতের কয়েক মাস বাদে অন্য সময়ে বাড়ীর চারিপাশে কার্বলিক এসিড ছিটানো।

(২) প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—বিষধর সাপে দংশন করলে দাঁতের দুটি দাগ দেখা যায়। সে যাই হোক, সাপে কামড়ালে বা সাপে কামড়েছে সন্দেহ হওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের একটু উপরে টুর্নিকেট চাপ বাঁধন অবশ্যই দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলা দরকার। ধোয়ার আগে ডেটল শোধিত ধারাল ছুরি বা ব্লেড দ্বারা ক্ষতস্থান চিরে সেখানকার রক্ত বের করে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

তারপর সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাঁধন আধঘণ্টার বেশী রাখলে রক্ত চলাচল বন্ধজনিত নানা রোগ দেখা দিতে পারে। সুতরাং বাঁধনের ২৫ সেমি. উপরে একটি বাঁধন দিয়ে নীচের বাঁধন আলগা করে দেওয়া চাই।

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বেশী নাড়াচাড়া না করতে দেওয়াই ভাল। শকের ভাব কাটাবার জন্য এক কাপ গরম

কফি বা চা দেওয়া যেতে পারে। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসগ্রহণের ব্যবস্থা করা চাই।

কখনও দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস করে রোজার হাতে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া বাঁধন খুলে দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

হুল ফোটানো [বোলতা, ভীমরুল, বিছা] ঃ

১। নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) অন্ধকারে ও খালিপায়ে রাস্তায় না চলা। (খ) ঘরের দেওয়ালের ফাটল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া। (গ) ঘরের ভিতরে আসবাব, আবর্জনা, কাঠ-ঘুঁটে স্তূপীকৃত না রাখা। (ঘ) জুতার ভিতরে দেখে পা ঢোকানো। (ঙ) বাড়ী ও আশেপাশের বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদির চাক ভেঙে ফেলা এবং চাকে আঘাত না করা।

(২) প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—(ক) ফাঁপা ও নলাকৃতি চাবিকাঠি হুল ফোটানো অংশে বসিয়ে জোরে টিপে ধরলে হুলটি শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সন্নার সাহায্যে তুলে ফেলতে হবে সেটিকে। এই চাপের ফলে ক্ষতস্থানে প্রবিষ্ট বিষাক্ত তরল পদার্থও বের হয়ে আসবে।

(খ) ক্ষতস্থানে সামান্য লাইকার এ্যামোনিয়াম প্রয়োগ করতে হবে। কোন কারণে মুখের ভিতর কি ঠোঁটে হুল ফোটালে ঘন করে সোডিয়াম কার্বনেট জলে গুলে, সেই জলে মুখ বা ঠোঁট ধুতে হবে।

(গ) এ্যাণ্টি এ্যালার্জি মলম ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে। তীব্র মারাত্মক এবং অধিক সংখ্যক হুল ফোটানোর ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কাছাকাছি ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে অবশ্যই নিয়ে যাওয়া দরকার।

(ঘ) হুল ফোটানোর তীব্রতা অনুসারে আহত ব্যক্তি শীঘ্র শীত অনুভব করে, বিবর্ণ হয়ে পড়ে, মূর্ছা যেতে পারে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অর্থাৎ নাড়ির বেগ দ্রুত হয়, বমির ভাব দেখা যায়, হাত পা মুখ ফুলে যায়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে অনর্থক ভয় পাওয়া উচিত নয় এবং এসব ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আগুনে পোড়া ঃ

১। নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) ঢিলে-ঢালা জামা-কাপড় পরে উনানের ধারে না বসা—বিশেষতঃ

শীতকালে। (খ) রান্নার পর উনানে আগুন না রেখে দেওয়া বিশেষতঃ খড়ের ঘরে। (গ) ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উনানের কাছে, প্রদীপের কাছে বা হ্যারিকেনের কাছে একা ছেড়ে না দেওয়া বা আগুন নিয়ে খেলতে না দেওয়া। (ঘ) সহজে আগুন লাগে এমন কোন পদার্থ আগুনের কাছাকাছি না রাখা। যেমন—স্পিরিট, পেট্রোল ইত্যাদি। (ঙ) যে সব রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে দেহে দাহের সৃষ্টি হয় সেগুলি ঘরে না রাখাই ভাল। (চ) আগুন ব্যবহার করা সম্পর্কেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। (ছ) বিছানার কাছাকাছি হ্যারিকেন বা প্রদীপ জ্বলে না রাখা। (জ) বিছানার ভিতরে ধূমপান না করা। (ঝ) ট্রেনে বা বাসে কোন সহজ দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাতায়াত না করা। (ঞ) স্টোভ, গ্যাস ওভেন ইত্যাদি সাবধানে ব্যবহার করা ও মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।

২। আগুনে পোড়ার ফলে দৈহিক প্রতিক্রিয়া ঃ— চামড়া পুড়ে লাল বা কালো হয়ে যায়। পোড়ার ফলে শক, ব্যথা, দাগ পড়া প্রভৃতি বিকার দেখা দেয়।

৩। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে রক্ষাকার্য ঃ—অগ্নিদগ্ধ বা অগ্নির কবলে পতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করার কাজ খুব ধীরস্থির ভাবে করতে হয়। জামা কাপড়ে আগুন

লাগলে ছোটাছুটি করতে নেই। ছোটাছুটি করলে বাতাসের সংস্পর্শে আগুন বেড়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুনের উত্তাপ ভিতরে চলে যায়। জামা কাপড়ের আগুন নেভানোর জন্য জল ঢালাও উচিত নয়। তার ফলে গায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়তে পারে। গায়ের জ্বালা যন্ত্রণা বেড়ে যেতে পারে। জামা কাপড়ে আগুন লাগলে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিলে আগুন তাড়াতাড়ি নিভে যায়।



কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হচ্ছে।

যার জামা কাপড়ে আগুন লাগে, ভয়ে সে বুদ্ধি

বিবেচনা হারিয়ে ফেলে। ছোটাছুটি করতে থাকে। সামনে যাকে পায়, বাঁচার জন্য জাপটে ধরে। তাই তার এমন কাছাকাছি যাওয়া উচিত নয়, যাতে সে ধরতে পারে। ধরার আগেই কৌশলে তাকে মাটিতে ফেলে কম্বল অথবা পুরু চট চাপা দিতে পারলে জামা কাপড়ের আগুন নিভে যাবে। ধর, ঘরে আগুন লেগেছে। ঘরের ভিতর ভীষণ ধোঁওয়া, একজন রুগ্ন লোক আছে ঘরের ভিতরে। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত জেনে রাখ।

কম্বল বা পুরুচট ভিজিয়ে নিয়ে, তাই নিয়ে নিজের গা সম্পূর্ণ বেঁধে ফেলতে হবে। এমনভাবে বাঁধতে হবে, যেন চট গা থেকে খুলে না যায়। দেখা ও নিশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা রেখে মুখ ও মাথা ঢেকে ফেলা চাই। সঙ্গে খানিকটা মোটা ও শক্ত সুতলী দড়ি নিতে হবে।

এখন ঘরে ঢুকে ঐ রুগ্ন ব্যক্তিটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে হবে।

অনেক সময় ঘর এত ধূমপূর্ণ থাকে যে, কিছু দেখা যায় না। হাতড়ে হাতড়ে ঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। হয়তো বা ধোঁওয়ায় দম আটকে যাওয়ায় ঘরে ঢোকা যায় না বা বিশেষ কষ্টকর হয়।

সে ক্ষেত্রে হাঁটু ও কনুই-এর উপর ভর দিয়ে বুক টেনে টেনে ঘরে ঢুকতে হবে। মেঝে থেকে সামান্য কিছু উপরে ধোঁয়ার চাপ তেমন বেশী থাকে না। তাই এভাবে ঘরে ঢুকলে দম আটকে যাওয়ার ভয় থাকবে না। ঘরে ঢোকার পর নির্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান করে তার হাতের কব্জী দুটি দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। দু'হাতের ফাঁকের মধ্যে নিজের মাথা গলিয়ে ঐভাবে বুক টেনে টেনে বেরিয়ে আসতে হবে ঘর থেকে।

৪। প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—(ক) আহত ব্যক্তিকে টান টান করে শুইয়ে দিতে হবে।

(খ) গায়ের জামা কাপড় টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করবে না। দেহের দগ্ধস্থানে জামা কাপড়ের অংশ লেগে গেলে তার চারপাশ কাঁচি দিয়ে কেটে নেবে। পেট্রোলে না ভিজিয়ে জামা কাপড় খোলা উচিত নয়।

(গ) রোগার গায়ে হাত বেশী না দেওয়াই ভাল। দিলেও খুব আস্তে দিতে হবে।

(ঘ) পোড়া সামান্য হলে বা চামড়ায় ক্ষত না হলে সেখানটি স্পিরিটে ভিজিয়ে দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

(ঙ) পোড়া জায়গা খুলে রাখলে ব্যথা বাড়ে। শরীরের পোড়া জায়গা সবসময় ঢেকে রাখতে হবে।

নির্বীজক তূলা এবং গজ দিয়ে সেখানটি ব্যাণ্ডেজ করে রাখবে।

(চ) ফোস্কা পড়লে সেগুলি যেন গেলে না যায় সেদিকে নজর রাখবে। জায়গাটি ঈষদুষ্ণ গরম জলে পরিষ্কার করে নিয়ে কাঁচা ডিমের তরল অংশ বা মধুর প্রলেপ বা চুনের জল ও নারকেল তেল কম পরিমাণে মিশিয়ে নিয়ে দেবে। বার্ণলও দিতে পারা যায়।

(ছ) ভাপে পুড়লে সামান্য ভিজা লবণ ক্ষতস্থানে পুরু করে দিয়ে রাখলেও উপকার পাওয়া যায়।

(জ) দেহের উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য খুব বেশী পুড়ে যাওয়া রোগীর গায়ে ভালভাবে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।

(ঝ) শকের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আহত ব্যক্তিকে গরম দুধ, চা বা কফি পান করানো দরকার।

(ঞ) সূর্যের উত্তাপে দেহের কোন স্থান ঝল্‌সে গেলে সেখানে ক্যালামি লোশন, অলিভ অয়েল, মাখন বা ইপসম্‌লবণ জল দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার।

(ট) কার্বলিক এসিডের স্পর্শে বা ঐ জাতীয় কোন

দ্রব্যের সংস্পর্শে পুড়ে গেলে, সেখানটি এলকোহল দিয়ে স্পঞ্জ করে দিতে হবে।

(ঠ) চুন জাতীয় পদার্থ লেগে চোখের ভেতর পুড়ে গিয়ে চোখ জ্বালা করলে দুগ্ধ, পরিষ্কার অলিভ অয়েল বা কয়েক ফোঁটা ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে চোখ ধুইয়ে দেবে।

(ড) শক্ লাগলে শকের চিকিৎসা করবে।

(ঢ) বেশী পুড়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করবে বা কাছাকাছি কোন হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে অথবা বজ্রপাতজনিত আঘাত :

১। নিরাপত্তা শিক্ষা :—(ক) বজ্রপাতের সময় ফাঁকা মাঠে চলাচল করবে না। উপায় না থাকলে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবে।

(খ) বজ্রপাতের সময় উঁচু গাছের নীচে দাঁড়াবে না।

(গ) বজ্রপাতের সময় ফাঁকা জায়গায় তারে কাপড় শুকাতে দেওয়া থাকলে ভিজে কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে না। তার ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। এইসব নিয়ম না মানলে দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হতে পারে, যার ফল অতীব বিপজ্জনক।

(ঘ) ভিজা হাতে ইলেকট্রিক সুইচ বা তার ইত্যাদিতে হাত দেবে না।

(ঙ) বাড়ীর ইলেকট্রিক লাইনে কোন গোলমাল আছে সন্দেহ হলে "মেন সুইচ অফ্" করে দিয়ে কাজ করবে।

(চ) ইলেকট্রিক লাইনের মেরামতী বা অন্য সব রকম কাজে কাঠের জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে করলে বিপদের ভয় থাকে না। হাতে রবারের দস্তানা পরে নেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে বাড়ীর ইলেকট্রিক্ ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

(ছ) ইলেকট্রিক লাইনের গোলমাল ইত্যাদি থাকার ফলে তার বা অন্য কিছুর সংস্পর্শে কেহ আহত হলে 'মেন সুইচ অফ্' করার আগে তাকে স্পর্শ করবে না।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—(ক) শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালু করা। (খ) শরীরে উত্তাপ বজায় রাখার জন্যে মোটা কাপড়ে গা ঢাকা দিয়ে রাখা। (গ) শক্ পেলে শকের চিকিৎসা করা। (ঘ) রোগীকে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা। (ঙ) সামান্য দুর্ঘটনার

ফলে শরীরের কোন অংশ পুড়ে গেলে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা করা। আঘাত যেমনই হোক, এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।

ক্ষত কেন হয় :

কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, কাঁটা, কাঠ, লোহা বা অন্য কিছুর সংস্পর্শে চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চলতি কথায় যাকে বলা হয় কেটে যাওয়া। ক্ষতের ফলে শরীর থেকে রক্তপাত হয় এবং রোগ জীবাণুর সংস্পর্শে ধনুষ্টঙ্কার, গ্যাংগ্রীণ ইত্যাদি ব্যাধি দেখা যায়। তা' ছাড়া সাধারণ ঘায়েরও সৃষ্টি হয়। সাবধানতার সঙ্গে চলাফেরা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে।

ক্ষত সম্পর্কে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা :—(ক) ধারালো অস্ত্র সাবধানে ব্যবহার করা। (খ) খালিপায়ে না চলা। (গ) সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা। (ঘ) শিশুকালেই ট্রিপল এ্যাণ্টিজেন নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা :—ক্ষতের সাধারণতঃ চারটি শ্রেণীভেদ :—(১) এব্রেসন, (২) ইনসাইজড

উণ্ড, (৩) ল্যাসিরেটেড উণ্ড ও (৪) পাংচারড উণ্ড। চামড়ায় ঘর্ষণের ফলে এব্রেসন উণ্ড হয়। জুতার ঘষা; কি রাস্তায় আছাড় খাওয়া, কি গাছে ওঠানামা করতে গিয়ে শরীরের কোন অংশে ঘষা লাগার ফলে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

ধারালো ছুরি, কাচ ভাঙা এবং অনুরূপ তীক্ষ্ণ মুখ অস্ত্র ব দ্রব্য শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে রক্তশিরা কেটে দেওয়ার ফলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকে বলে ইনসাইজড উণ্ড। ইনসাইজড উণ্ডে ছেঁড়া বা থেতলে খুব কমই যায়। তাড়াতাড়ি রক্তপাত বন্ধ করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারলে জীবাণুর সংস্পর্শে ক্ষতস্থানে দূষিত ঘা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

ভোঁতা যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতকে বলা হয় ল্যাসিরেটেড উণ্ড। বুলেট, বোমার স্প্লিণ্টার, ভোঁতা যন্ত্র, হিংস্র পশুর থাবার ঘায়ে এই ধরনের ক্ষত হয়। এই ক্ষতে তত রক্তপাত হয় না। ল্যাসিরেটেড উণ্ডের মুখ বেশ বড় হয় এবং ক্ষত এবড়োখেবড়ো হয়ে থাকে। থেঁতলে যায় বলে ভিতরে ময়লা জমে থাকাও বিচিত্র নয়। রক্তপাত কম হওয়ার দরুন ক্ষতস্থান সেপ্টিক হয়ে যেতে পারে।

কোন অস্ত্রের কোন অংশ শরীরের একদিকে প্রবেশ

করে অন্য দিকে বাহির হওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতকে বলা হয় পাংচারড উণ্ড। এই ধরনের আঘাতে অস্ত্র প্রবেশের ক্ষত অপেক্ষা অস্ত্র বাহির হওয়ার দরুন ক্ষতটি আকারে বড় হয়।

ক্ষতের সঙ্গে সঙ্গে হাড়ও ভেঙে যেতে পারে। সুতরাং কাটা অঙ্গটিতে খুব সাবধানে হাত দিতে হবে—যাতে ব্যথা না লাগে।

ক্ষত সামান্য হলে পরিষ্কার তুলোয় ডেটল নিয়ে সেখানটি মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ক্ষতের মুখ আটকে দিলেই কাজ চলে। মুখ আটকানোর আগে ক্ষতস্থানে সামান্য সালফানিলামাইড পাউডার দিয়ে ড্রেসিং করা ভাল। সামান্য থেতলে গেলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটি দিলে উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষতের ফলে শরীরের কোন অংশ কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে সেখানটি প্রত্যহ ডেটল মিশ্রিত গরম জল দিয়ে ধুয়ে সালফানিলামাইড পাউডার দিয়ে ড্রেসিং করে বেঁধে রাখা দরকার। খোলা থাকলে জীবাণুর সংস্পর্শে বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। ক্ষত যত সামান্যই হোক এ্যাণ্টিটিটেনাস ইনজেকশান নেওয়া প্রয়োজন।

রক্তপাত তীব্র হলে, তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা

দরকার। ক্ষতস্থানের ভিতরে কাচের টুকরা, গজাল, কাঠের কোন অংশ আটকে থাকলে খুব সাবধানতার সঙ্গে তা টেনে বাহির করা দরকার। সহজে বাহির না হলে বেশী টানাটানি না করা ভাল।

প্রাথমিক চিকিৎসাকারী নিজের হাত কোন জীবাণুনাশক সাবানের দ্বারা ধুয়ে তবে ক্ষতে হাত দেবে। তবে রক্তপাত তীব্র হলে অনর্থক দেরী না করাই ভাল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তপাত বন্ধ করা উচিত। খুব সাবধানতার সঙ্গে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করা উচিত। ব্যাণ্ডেজের যে অংশ ক্ষতের উপরে দেওয়া হয়, সেখানে হাত না দেওয়াই উচিত।

রক্তপাত বেশী হলে ক্ষতের উপর তুলোর প্যাড দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। ব্যাণ্ডেজ বেশ আঁটসাঁট করে বাঁধা দরকার।

গুরুতর আঘাত ও রক্তপাতে অনেক সময় শকের লক্ষণ দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে এক কাপ গরম দুধ বা কফি খাইয়ে দেওয়াই ভাল। শক্‌প্রাপ্ত হবে শকের চিকিৎসা করা চাই।

সামান্য কাঁটা ছেঁড়া বাদে সবসময়েই রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।

হাড়ভাঙা ঃ

১। নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা। (খ) গাছে বা উঁচু জায়গায় সাবধানে ওঠা বা নড়াচড়া করা। (গ) গাড়ীতে সাবধানে ওঠা-নামা করা।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—নানা প্রকারের অস্থি-ভঙ্গ হতে পারে। যেমন—সরল, মিশ্র, সম্পূর্ণ এবং গ্রীনস্টিক বা অসম্পূর্ণ হাড় ভাঙা, কমিনিউটেড, ইম-প্যাক্টেড্ ও ডিপ্রেসড্ হাড় ভাঙা।

সরল হাড় ভাঙায় বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন থাকে না। মিশ্র হাড় ভাঙায় ভাঙা হাড়ের নীচের দিকের কোমল তন্তুগুলি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে দেহের বাহিরে আঘাতের চিহ্ন প্রকট হয়ে ওঠে। জটিল হাড় ভাঙায় শিরা, ধমনী ও স্নায়ুতন্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অস্থিসন্ধি খুলে যায়।

হাড় ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলে তাকে বলে সম্পূর্ণ হাড় ভাঙা।

আংশিক ভেঙে যাওয়া এবং আংশিক বেঁকে যাওয়ার নাম গ্রীনস্টিক বা অসম্পূর্ণ হাড় ভাঙা। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এ ধরনের হাড় ভাঙা দেখা যায়।

হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়াকে কমিনিউটেড্ হাড় ভাঙা বলে। একটি ভাঙা হাড় অন্যটির মধ্যে ঢুকে পড়ার নাম ইম্প্যাক্টেড্ হাড় ভাঙা। সাধারণতঃ ভাঙা জায়গায় হাত দিলে খট্‌খট্ শব্দ হয়। কিন্তু এই ধরনের হাড় ভাঙায় কোন শব্দ হয় না।

মাথার খুলির হাড় ভেঙে মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে পড়াকে বলে ডিপ্রেসড্ হাড় ভাঙা।

হাড় ভাঙার লক্ষণ ঃ

যেখানকার হাড় ভেঙে যায় সেখানে বেদনাবোধ হয়। সেখানকার নড়াচড়ার শক্তি লোপ পায়। সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিকৃতি দেখা যায়। আঘাতের কাছাকাছি অংশ অনেক সময় ফুলে যায়। ভাঙা এক অংশ অপর অংশে উঠে আসতে পারে। ফলে সে অঙ্গটি ছোট দেখায়।

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আহত ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া এবং ব্যথার উপশম ঘটানো।

কাপড় জামা না খোলার চেষ্টা করাই ভাল। কাপড় জামা দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করে।

আহত ব্যক্তির আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে হাত না দেওয়াই ভাল।

সরল ও মিশ্র হাড় ভাঙার ক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের ব্যাণ্ডেজ ও স্প্লিণ্ট বেঁধে তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানা ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাড় সেট করার চেষ্টা কোনমতেই করা উচিত নয়।

রক্তপাত হলে সম্ভাব্যক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। তবে যাতে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বেদনাবোধ না হয়, সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।

হাড় সেট করার জন্য অজ্ঞান করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সুতরাং আহত ব্যক্তিকে কিছুই খেতে দেওয়া উচিত হয়। বড়জোর শকের ধকল কাটানোর জন্য গরম চা, কফি বা দুধ দেওয়া যেতে পারে।

হাড় ভাঙার রোগীকে স্ট্রেচারে শুইয়ে তবে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। স্ট্রেচারের অভাবে লম্বা ও মোটা চটের থলের দু'পাশে ডাণ্ডা বেঁধে খাটিয়া তৈরী করে নিতে হবে। অভাবে 'চারপায়া'কে স্ট্রেচার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফিট, মূর্ছা ও সর্দিগর্মি ঃ

নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম

না করা বা পরিশ্রমের অবসরে বিশ্রাম নেওয়া। (খ) হিস্টিরিয়া, মৃগী প্রভৃতি রোগযুক্ত ব্যক্তিদের উত্তেজনা-মূলক কথা বা কাজ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। (গ) জনবহুল বদ্ধ ঘরে বেশীক্ষণ না থাকা। (ঘ) অতিরিক্ত ক্ষুধাবোধের সুযোগ না দেওয়া। (ঙ) রোদে অনেকক্ষণ থাকার পর সঙ্গে সঙ্গে জল পান না করা। কিছুক্ষণ পরে, প্রথমে অল্প লবণ মিশ্রিত জল পান করে পরে জল পান করা।

প্রাথমিক চিকিৎসাঃ— দাঁতে দাঁত লেগে গেলে আগে চামচ বা কোন দ্রব্যের সাহায্যে দাঁত ছাড়িয়ে দিয়ে জিভকে সাবধানে রাখা। রোগী হাত পা ছুঁড়লে তা ধরে রাখা। খোলা হাওয়ায় রোগীকে শুইয়ে রাখা এবং গায়ের জামা-কাপড় আলগা করে দেওয়া। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে চিত করে শুইয়ে দেওয়া। মুখে ঠাণ্ডা জলের জোর ঝাপটা দেওয়া। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত স্মেলিং সল্ট শুঁকতে দেওয়া। জনবহুল ঘরে মূর্ছা গেলে তাকে চেয়ারে বসিয়ে তার দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা চেপে ধরা এবং মুখ লাল হয়ে যাওয়ার পর তাকে খোলা হাওয়ায় চিত করে শুইয়ে দেওয়া।

জ্ঞান হওয়ার পর গরম চা, কফি বা ঠাণ্ডা জল খেতে দেওয়া।

হৃৎপিণ্ডের অসুখের জন্য অনেকে অনেক সময় মূর্ছা যায়। সুতরাং ডাক্তারের পরামর্শ মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সবসময়েই কর্তব্য।

দেহের বিভিন্ন অংশে কোন কিছু ঢুকে বিঁধে যাওয়া বা ক্ষত হওয়া ঃ

নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) ছোট ছেলেদের হাতে এমন কিছু দেওয়া উচিত নয় বা তাদের হাতের নাগালে এমন কিছু রাখা উচিত নয় যা তারা সহজে খেয়ে ফেলতে পারে বা যা দিয়ে চোখ কান বা নাক খোঁচাতে পারে। (খ) বাচ্চাদের কানে সুড়সুড়ি দেওয়ার অভ্যাস না করাই ভাল। অনেক সময় কাটি খোঁচা কুড়িয়ে নিজেরাই কানে সুড়সুড়ি দিতে যায়। ফলে রক্তপাত হয়। (গ) মাছ ও মাংসের হাড় ভালভাবে বেছে তবে তা শিশুদের খেতে দেওয়া বা খাওয়ানো উচিত। (ঘ) তাড়াতাড়ি খেতে নেই বা খাওয়ার সময় বিশেষতঃ শিশুদের উত্যক্ত বা বিরক্ত করা উচিত নয়। (ঙ) সেপ্টিপিন শিশুদের জামায় ব্যবহার না করাই ভাল।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—(ক) কানে পোকা ঢুকলে

এমনভাবে ঘাড় কাত করে মাথা নীচু করবে যেন সে কানটি উপরের দিকে থাকে। সেই অবস্থায় কানের ভিতর ক্যাস্টর অয়েল, অলিভ অয়েল বা গরম সরষের তেল দিতে হবে। মিনিটখানেক পরে সেই কানটি নীচু করে কিছুক্ষণ থাকতে হবে ও ঝাঁকানি দিতে হবে মাঝে মাঝে।

(খ) কানের ভিতরে কোন কিছু ঢুকে গেলে তা যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে কোন সরু দ্রব্যের সাহায্যে আস্তে আস্তে বাহির করতে হবে। একেবারে বিঁধে গেলে টানাটানি করা উচিত নয়। এইসব ক্ষেত্রে এবং পেন্সিল বোতাম ইত্যাদি গোলাকার বস্তু ঢুকে আটকে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

(গ) কোন কিছু চোখে পড়লে চোখ রগড়ে রগড়ে তা বাহির করা উচিত নয়। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় উপকার পাওয়া যায়। অন্যথায় চোখের জলেই তা স্বাভাবিক নিয়মে ধুয়ে বেরিয়ে আসবে। আইলোশন ব্যবহার করতে পারা যায়। এসবে কোন কাজ না হলে ক্যাস্টর অয়েল বা অলিভ অয়েল দিয়ে চোখ বেঁধে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে পাঠানো উচিত।

(ঘ) নাকের ভিতর কোন কিছু আটকে থাকলে

জোরে হাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুকূল অবস্থায় থাকলে সরু মুখ সন্নার সাহায্যে তা বাহির করা যায়। এসব ব্যবস্থায় কোন কাজ না হলে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

(ঙ) মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড়ের টুকরা গলায় আটকালে শুক্‌নো ভাত ডেলা পাকিয়ে গিলে খেতে হবে। পাকা কলা টুক্‌রো মত করে গিলে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।

(চ) ছোট পয়সা, মার্বেল, বোতাম ইত্যাদি গিলে নেওয়ার ফলে আটকে গেলে জিভের পিছনে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা বাহির করার চেষ্টা করবে।

(ছ) এসব ক্ষেত্রে শিশুকে উল্টো অবস্থায় মুখ নীচের দিকে করে ধরে ঝাঁকানি দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে অবস্থা সঙ্গীন মনে হলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।

বিষ খাওয়া ঃ

নিরাপত্তা শিক্ষা ঃ—(ক) ইঁদুর, আরশোলা বা মাছিমারা ওষুধ সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং সেগুলি শিশুদের হাতের নাগালে না রাখা। (খ) ঐ সব ওষুধ ব্যবহার করলে খাদ্যদ্রব্য ও জলপাত্র ঢেকে

রাখা। (গ) ব্যবহৃত খালি কৌটা এবং প্যাকেট ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে ফেলা অথবা পুড়িয়ে দেওয়া। (ঘ) ফসলে কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করার পর অন্ততঃ ১০ দিন সে ফসল না খাওয়া। (ঙ) ওষুধ ব্যবহারের পর তোলা জলে হাত এবং ওষুধ গোলার পাত্র সাবান জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলা। (চ) ওষুধ নিয়ে কাজ করার সময় কোন কিছু না খাওয়া, ধূমপান না করা। হাত ঢেকে নিয়ে বা হাত না ঠেকিয়ে কোন বস্তুর সাহায্যে ওষুধ গোলাই ভাল।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—(ক) এসিড জাতীয় দ্রব্য বাদে অন্যান্য বিষ ভক্ষণের ক্ষেত্রে রোগীকে বমি করানো। লবণ গোলা জল, সরিষা গোলা জল, ডিমের সাদা অংশ গোলা জল ইত্যাদি খাওয়ালে বমি হয়। গলায় পালকের সুড়সুড়ি দিলেও বমি হয়। (খ) রোগীকে ঘুমাতে না দেওয়া। (গ) বমি করানোর পরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে কাছাকাছি ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে অবশ্যই পাঠানো দরকার।

কি কি নিয়ম মেনে চললে মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হয় না, এতক্ষণ সে কথা আলোচনা করা হল। দুর্ঘটনার ফলে আহত হলে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে

হয়, সে কথাও মোটামুটি বলা হয়েছে। এবার দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার নির্দিষ্ট কয়েকটি কৃত্যাদির প্রায়োগিক দিকগুলি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হচ্ছে। এগুলি প্রত্যেক প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর জেনে রাখা দরকার। এগুলি জানা না থাকলে ঠিকমত প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায় না।

শক্ লাগা ঃ

দুর্ঘটনার ফলে আঘাত গুরুতর হলে মানুষ শক্ পায়। আর এই শকের ফলে রোগী অনেক সময় মারা যায়। কাজেই শকের লক্ষণ এবং শকের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান প্রাথমিক চিকিৎসা-কারী মাত্রেরই থাকা দরকার।

শকের লক্ষণ ঃ—(১) দুর্বলতা অনুভব করা, (২) মাথাঘোরা ও বমি বমি ভাব হওয়া, (৩) চোখের তারা ঘোলাটে, ফ্যাকাশে এবং সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হওয়া, (৪) অনিয়মিত শ্বাস-ক্রিয়া, (৫) নাড়ি স্পন্দন দ্রুত ও দুর্বল হওয়া, (৬) গায়ের চামড়া আর্দ্র ভাব ইত্যাদি।

শকের প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ—(১) রোগীর দু'পা তোষক বা বালিসের উপর উঁচু করে রাখবে। খুব বেশী উঁচুতে নয় মাটি থেকে ৯-১০ ইঞ্চি মাত্র। তবে পায়ের হাড় ভেঙে গেলে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত নয়।

(২) রক্তপাতের ক্ষেত্রে প্রথমেই রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

(৩) শরীরের উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য গরম চা, কফি বা দুধ খাইয়ে দেবে। তবে রোগী অচৈতন্য হয়ে গেলে, বুক বা পেটে আঘাত লাগলে এবং গুরুতর অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রে মোটেই কিছু খেতে দেবে না।

(৪) মাটির ঠাণ্ডা যাতে গায়ে না লাগে সেজন্য গায়ে ভালভাবে শুক্‌নো কম্বল জড়িয়ে দিতে হবে।

(৫) রোগীর পরিচ্ছদ প্রয়োজন হলে আল্‌গা করে দেবে কিন্তু একেবারে খুলে ফেলবে না। দেহের কোন অংশ খোলা রাখার প্রয়োজন হলে কাপড়চোপড় আংশিক খুলে সেখানে তা ভাঁজ করে রাখবে।

(৬) হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলে গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করবে। তবে লক্ষ্য

রাখতে হবে যে দেহ থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঘাম না বাহির হয়।

(৭) জ্ঞান বুদ্ধিমত শকের চিকিৎসা শুরু করবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে পাঠাতে যেন ভুল না হয়।

(৮) রোগীর চারপাশে ভিড় জমতে দেবে না।

রক্তপাত বন্ধ করা ঃ

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত চলাচলের জন্য সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে দু'রকমের নল—শিরা আর ধমনী। আঘাতের ফলে শিরা ও ধমনী কেটে গেলে রক্তপাত প্রবল হয়। সে রক্ত স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয় না বা টিংচার আয়োডিন কি অনুরূপ ওষুধের প্রয়োগেও বন্ধ করা যায় না। তার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে।

তুলোর প্যাড বা প্যাডে কোন একটা শক্ত জিনিস মুড়ে সেখানটা চেপে ধরবে। তারপর পরিষ্কার রুমাল বা কাপড়ের ফালি দিয়ে চেপে বাঁধবে।

তাতে বন্ধ না হলে, কাটা জায়গার একটু উপরে

রবারের নল অথবা কাপড়ের শক্ত পাড় দিয়ে বেশ শক্ত করে একটা বাঁধন দেবে। সেই বাঁধনের ভিতর একটা শক্ত কাঠি গলিয়ে দু'তিনটে পাক দেবে। তারপর সেই কাঠিটি আটকে দেবে বাঁধনের মধ্যেই। অবশ্য হাত-পা কেটে গেলেই এভাবে বাঁধন দেওয়া সম্ভব। ইহার নাম টুর্নিকেট চাপ। টুর্নিকেট চাপ ১৫ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। তারপর একবার বাঁধন আল্‌গা করে দেখবে, রক্তপাত বন্ধ হল কি না। না হলে আবার চাপ প্রয়োগ করবে। ইতিমধ্যে ডাক্তার না পাওয়া গেলে আহত ব্যক্তিকে কাছাকাছি কোন হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় অবশ্যই নিয়ে যাবে।

সামান্য রক্তপাতে ক্ষতস্থানে ফটকিরি প্রয়োগ করলেও সুফল পাওয়া যায়।

স্‌প্লিণ্ট তৈরি করা ও বাঁধা :

হাড় ভেঙে গেলে স্‌প্লিণ্টের দরকার হয়। ফাঁপা ও মোটা বাঁশ লম্বালম্বি চিরে চারখণ্ড কর। সেগুলি ভালভাবে চেঁচে ছুলে নিয়ে ৪৫ সেমি. টুকরা করে কাট। এই ধরনের কাঠের বাতা দিয়েও কাজ চলে যেতে পারে। হাতের কাছে কিছু না পেলে পায়ের হাড়

ভাঙার ক্ষেত্রে দু'পাশে দু'টি ছাতা বেঁধে স্প্লিণ্টের কাজ চলতে পারে।

যেখানকার হাড় ভেঙেছে, সেখানকার উপর-নীচ পুরু তুলো অথবা ভাঁজ করা কাপড় দিয়ে ঢেকে, দু'পাশে স্প্লিণ্ট রাখ। তারপর রুমাল, কাপড়ের পাড় বা দড়ি দিয়ে বাঁধ। ভাঙা হাড় যেন বেশী নড়াচড়া না করে।

স্প্লিণ্ট বাঁধা সম্ভব না হলে পুরু তুলো অথবা ভাঁজ করা কাপড় বসিয়ে সেখানটি বেঁধে রাখবে।

অযথা নড়াচাড়া করবে না। অবশ্যই হাসপাতাল বা কাছাকাছি ডাক্তারখানায় স্ট্রেচার বা খাটিয়ায় করে নিয়ে যাবে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা :

প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর অবশ্যই ব্যাণ্ডেজ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। ব্যাণ্ডেজ নানা ধরনের হয়। যেমন, ত্রিকোণ, স্পইকা, রোলার ইত্যাদি। প্রাথমিক চিকিৎসাকারী ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজই ব্যবহার করবে। অন্যান্য ব্যাণ্ডেজগুলির ব্যবহার প্রক্রিয়া একটু জটিল।

প্রয়োজন অনুসারে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজকে বহুরকমভাবে ভাঁজ করে বাঁধা যায়। যেমন, একবার ভাঁজ করে, একাধিকবার ভাঁজ করে।

ব্যাণ্ডেজে গিঁট বাঁধা সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। সাধারণ গিঁট বাঁধা দু'ধরনের—গ্র্যানি নট ও রীফ নট। ব্যাণ্ডেজে রীফ নট দেওয়াই উচিত। কেননা রীফ নট সহসা খোলে না। ব্যাণ্ডেজের বাম হাতের শেষ প্রান্ত ডান হাতের উপর এবং ডান হাতের প্রান্তদেশ বাম হাতের উপরে দাও। এইভাবে রীফ নট বাঁধতে হয়।

বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাণ্ডেজ ঃ

হাতের ব্যাণ্ডেজ ঃ— ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজটি সমানভাবে পাত। হাতের তালুর নীচের দিকে করে খোলা হাতটি ব্যাণ্ডেজের নীচের দিক থেকে ৭·৫ সেমি· উপরে রাখ। ব্যাণ্ডেজের আগার দিকটা নিয়ে এসে হাতের কব্জি পুরোপুরি ঢেকে ফেল। এবার ব্যাণ্ডেজের দুই প্রান্ত কব্জির উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে কব্জির পিছনে বেঁধে ফেল। ব্যাণ্ডেজের আগাটি পিন দিয়ে আটকে দাও। পিন না পেলে ঠিক উহার উপরেই ব্যাণ্ডেজের গিঁট শক্ত করে বাঁধ।

কনুইয়ের ব্যাণ্ডেজ ঃ—কনুইকে সমকোণ অবস্থায় বেঁকিয়ে নাও। ব্যাণ্ডেজের নীচের দিকের ৭·৫ সেমি. অংশ মুড়ে ফেল। এবার ব্যাণ্ডেজটি কনুইএর পিছনে রাখ। ব্যাণ্ডেজের আগাটি বাহুর পিছনে আধাআধি জায়গায় এবং নীচের দিক বাহুর সামনের দিকে ঠিক



ব্যাণ্ডেজ

মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে। দুই দিক একত্র করে ও একটির উপর আর একটি দিয়ে কনুইএর উপরে

পিছনের দিকে আন এবং কয়েকবার এভাবে ঘুরিয়ে কনুইএর ৮ সেমি আন্দাজ উপরে বাঁধ।

কাঁধের ব্যাণ্ডেজ ঃ—ছ'টি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন। একটি ব্যাণ্ডেজ কাঁধের উপর এমন ভাবে রাখা চাই যেন তার অগ্রভাগ কাঁধের উপর ঠিক কানের নীচে থাকে।

এবার ব্যাণ্ডেজের বাকী ছ'টি কোণ একত্র করে বার বার ঘুরিয়ে বাহুর উপরে বেঁধে ফেলতে হবে।

আর একটি ব্যাণ্ডেজের ছ'প্রান্ত আঘাত-প্রাপ্ত কাঁধের উপরে রেখে গিট দাও। প্রান্তটি বুকের কাছে ঝুলবে। এই ঝোলানো ব্যাণ্ডেজটির ভিতরে আঘাতপ্রাপ্ত কাঁধের সংলগ্ন হাতটিকে রাখ। ইহাকে আর্ম স্লিং বলা হয়।

হাঁটুর ব্যাণ্ডেজ ঃ—হাঁটুর প্যাটেলা ভেঙে গেলে ব্যাণ্ডেজ করার প্রয়োজন। একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ হাঁটুর সামনে এমনভাবে রাখ যেন ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগ উরুর মঝোমাঝি অংশে থাকে। নীচের অংশ ৫ সেমি আন্দাজ ভিতরের দিকে মুড়ে ফেল। ব্যাণ্ডেজের অপর ছুই প্রান্ত উরু সন্ধির একটু উপরে রেখে ঘুরিয়ে সামনের দিকে নিয়ে এস ও বাঁধন দাও।

কৃত্রিম শ্বাস-ক্রিয়া ঃ

দুর্ঘটনার ফলে বিশেষতঃ জলে ডোবার ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় আহত ব্যক্তিকে মৃত মনে হয়। এই সময় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালু করতে পারলে রোগীকে বাঁচান যায়। কিভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস কাজ চালু করা হয়, তা জেনে রাখ।

কৃত্রিম শ্বাস-ক্রিয়া ব্যবস্থা মোটামুটি তিন প্রকারের ঃ—(১) শেফার পদ্ধতি (২) সিলভেস্টার পদ্ধতি (৩) ইভ পদ্ধতি। প্রথমেই রোগীর কোমরের কাপড় আল্‌গা করে দিতে হবে এবং নাকে মুখে কিছু আটকানোর ফলে শ্বাস-পথ যেন রুদ্ধ না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

শেফার পদ্ধতি ঃ—সচরাচর এই পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়—আহত ব্যক্তিকে উপুড় করে শুইয়ে দাও মাথা একপাশে কাত করে দাও এবং দু'হাত মাথার উপর দিকে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে রাখ। মুখের ও নাকের কোন বাধা যেন না থাকে।

রোগীর জঙ্ঘার কাছে রোগীর দিকে মুখ করে হাঁটু

গেড়ে বস। কোমরের ঠিক উপরে দু'হাতের পাতা এমনভাবে রাখ যেন আঙ্গুলগুলি দু'পাশের পঞ্জরাস্থির উপরে পড়ে এবং দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যেন একই সরলরেখায় অবস্থিত হয়।

এইবার ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে একটু চাপ দাও। হাত যেন না বাঁকে। এই অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থাক। পিছনে হেলে চাপ ছাড়। ২ সেকেণ্ড পরে আবার ঐভাবে চাপ দাও। মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার এভাবে চাপ দেওয়া ও ছাড়া চলতে থাকলে শ্বাস-ক্রিয়া স্বাভাবিক হবে। স্বাভাবিক হওয়ার পরেও অন্ততঃ ১৫ মিনিট এভাবে চাপ দিয়ে যেতে হবে।

সিলভেস্টার পদ্ধতি ঃ—আহত ব্যক্তির ঘাড়ের নীচে শক্ত কম্বল ভাঁজ করে অথবা বালিস রেখে তাকে চিত করে শোওয়াও। এভাবে শোওয়ালে তার মাথা পিছনের দিকে একটু হেলে পড়বে।

হাত দু'টি মাথার উপরের দিকে নিয়ে এস। নিজের দু'হাত দিয়ে কনুই-এর ঠিক একটু নীচে তার দু'হাত ধর। বাহু দু'টিকে টেনে যতদূর পারা যায় নিজের দিকে নিয়ে এসে ২ সেকেণ্ড আন্দাজ ধরে রাখ। তারপর হাত

দু'টি পাঁজরার দু'পাশে নিয়ে গিয়ে চাপ দাও। ২ সেকেণ্ড এভাবে থাক। এইভাবে কাজ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়।

ইভ পদ্ধতি ঃ—ইহার জন্য চাই ৩ ফুট উঁচু দণ্ডযুক্ত একটি কাঠের ফ্রেম ও একটি স্ট্রেচার। স্ট্রেচারে উপুড় করে রোগীকে শোওয়াও ও তার দু'হাত পা শক্ত করে স্ট্রেচারের সঙ্গে বেঁধে ফেল। ফ্রেমের উপরিভাগে স্ট্রেচারটি এমন ভাবে রাখ যেন রোগীর মুখ নীচের দিকে থাকে। স্ট্রেচারটিকে ইচ্ছামত উঠা-নামা করানোর ব্যবস্থা থাকা চাই। ঐ ভাবে স্ট্রেচার রেখে মিনিটে অন্ততঃ ১২ বার ওঠা-নামা করিয়ে দোলাতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের গুণ ঃ

(১) বিপদে ধৈর্য হারালে চলবে না। স্নায়ু বেশ শক্ত হওয়া দরকার।

(২) ভয় পেয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে রোগীকে ঘাবড়ে দিলে চলবে না।

(৩) অনর্থক দেরী করবে না। আবার অনর্থক

ব্যস্ততা দেখাতে গিয়ে কোন কাজে ভুল করবে না বা আঘাতজনিত যন্ত্রণা বৃদ্ধি করাবে না।

(৪) প্রাথমিক চিকিৎসককে অবশ্যই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং সাঁতারে পটু হতে হবে।

(৫) লজ্জা, ঘেন্না, ভয়—তিন থাকতে প্রাথমিক চিকিৎসা নয়। যুবতী মেয়ের কাপড়ে আগুন লেগেছে। তার গা থেকে টেনে কাপড় খুলে নিতে লজ্জা করলে সেই লজ্জার ফলে রোগীর প্রাণহানি ঘটতে পারে।

(৬) প্রাথমিক চিকিৎসকের অন্যতম গুণ অসীম সাহস ; কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে হতে হবে সদা সতর্ক এবং অসীম সাহসের অধিকারী। উদ্ধার বা প্রাথমিক চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে আহত হলে চলবে না।

(৭) প্রাথমিক চিকিৎসকের ধর্ম ও সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হবেন, মনে রাখতে হবে—সেবার কোন জাতি ধর্ম নেই।

(৮) আপন জ্ঞান বুদ্ধির বাইরে কোন কিছু করবে না, যাতে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়। বৃথা আত্মসম্মান

বা বাহবার বশীভূত হয়ে রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে যেন ইতস্ততঃ করবে না।

(৯) প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক চিকিৎসককে কঠোর ও স্পষ্টবাদী হতে হবে। যেমন, রোগীর কাছে ভিড় করা, কি সাপে কাটা রোগীর বাঁধন না বাঁধা, ওঝার কথায় বাঁধন খুলে না দেওয়া ইত্যাদি।

(১০) হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ শুরু করে দেবে। উপকরণের সন্ধানে অনর্থক দেরী করে রোগীর জীবন বিপন্ন করে তুলবে না।

(১১) প্রাথমিক চিকিৎসকের রক্তপাত বন্ধ করা বাঁধন দেওয়া, ব্যাণ্ডেজ করা, কৃত্রিম শ্বাস-ক্রিয়া চালু করা এবং শকের চিকিৎসার প্রয়োগগত দিকগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করা দরকার। কোন শিক্ষণ না থাকলে স্থানীয় ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এইসব কাজ হাতেকলমে শিখে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

কল-কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা :

কল-কারখানায় দুর্ঘটনার কথা আমরা প্রায়ই শুনি। অসতর্ক থাকার জন্যই এইসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হলে এইসব দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

কল-কারখানার নিরাপত্তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয় ঃ—

(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

(২) কারখানার নিরাপত্তা

(৩) সাধারণ নিরাপত্তা

যে সব বিষয়ে সাবধান হলে কর্মরত শ্রমিক দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয় না বা দুর্ঘটনা ঘটে না, সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কর্মরত শ্রমিকদের এইসব নিয়মগুলি মেনে চলা দরকার ঃ—

ঢিলা জামা কাপড় গায়ে দিয়ে কোন কাজ না করা বা মেসিন না চালানো।

যে সব জিনিসে চট করে আগুন লেগে যায়, সেই সব জিনিস নিয়ে কাজ করার সময় বিড়ি সিগারেট না খাওয়া ও আগুন না জ্বালা।

অবসন্ন শরীরে এবং ঘুম ঘুম চোখে কাজ না করা।

কারখানা চালু থাকার সময় নানা কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। তাই আগুন নেভানোর সময় সব রকম ব্যবস্থা হাতের কাছে রাখা দরকার। মেসিন চালু রেখে তা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেগ বা শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়। এইসব নিয়ম মেনে চললে কল-কারখানায় সহসা দুর্ঘটনা ঘটে না।
